সঙ্কর্ষণাবতার রামানুজাচার্য্য

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

বিশুদ্ধ চৈতন্যময় পরাসংবিতের কর্ষণরূপ নিবৃত্তি শক্তি হইতে যিনি সমুদ্ভূত হন তিনি ''কৃষ্ণ''; সবকিছুকে আকর্ষণ করা এঁনার স্বভাব। আকর্ষণ করিবার ''ইচ্ছা'' বা এষণা স্বভাব হইতে যাঁহার উদ্ভব, তিনি ''শেষ'', তিনি ''সঙ্কর্ষণ'' এবং ''বলদেব'' নামে অভিহিত হন। 'সঙ্কর্ষণ' বা সম অর্থে সম্যক সদৃশ, কর্ষণ অর্থে আকর্ষণ; কৃষ্ণের আকর্ষণ শক্তিই দিব্যরূপ পরিগ্রহ করিয়া হন সঙ্কর্ষণ। 'শেষ' শব্দের 'শ' অক্ষরে শত বুঝায়। শতধারায় এষণার চরম প্রকাশই হইল 'শেষ'। অর্থাৎ, বিশুদ্ধ সত্ত্বের ইচ্ছার সমষ্টিভূত শক্তির সগুণ প্রকাশরূপই হইল ''শেষ''। সঙ্কর্ষণ শক্তি বা কর্ষণ শক্তি বলিতে ক্ষেত্রকে ক্ষুব্ধ করিবার শক্তি বা কর্ষণ শক্তিকেই বুঝায়। সেই কারণে সঙ্কর্ষণ বা বলরামের হস্তে লাঙ্গল ধারণ করিতে দেখা যায়। 'বলরাম' শব্দের অর্থ হইল, বল — শক্তি, রাম — রম ক্রীড়া করা অর্থাৎ যিনি রমার সহিত রমণ করেন তিনিই ''রাম'' শব্দবাচ্য। রমা চঞ্চলা প্রাণশক্তি; ইনিই আদ্যা প্রকৃতি। এই চঞ্চলা প্রাণশক্তির মধ্যে যে স্থিরত্বের ক্রীড়ারূপ অবস্থা, তাহাই 'বলরাম' পদবাচ্য। ইনিই শুক্ল যজুঃ। শরীররূপ ক্ষেত্র কর্ষণ দ্বারা আত্ম-উন্নতি লাভ হইয়া থাকে। বলরামরূপী ক্ষেত্রকর্ষণকারী গুরুরূপী কৃষকই ক্ষেত্রজ্ঞ পদবাচ্য। প্রাণের স্থিরাবস্থারূপ পরমাত্মাই ক্ষেত্রজ্ঞ আর জীবের জীবন স্বরূপ প্রাণই হইলেন শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ 'কৃষ্' ধাতু অর্থে কর্ষণ করা রূপ কৃষিকর্মকে বুঝায়; অর্থাৎ, প্রতি জীবদেহে অজপারূপী ক্রিয়া স্বভাবতঃ যাহা চলিতেছে তাহাই কৃষিকর্ম। সেই কৃষিকর্মের নিবৃত্তি রূপ অবস্থাই 'কৃষ্ণ' পদবাচ্য। ইনিই কৃষ্ণ যজুঃ।

শ্রীবলদেব

পুরাণে আছে যে পাতালাদির নিম্ন ভাগে বিষ্ণুর 'শেষ' নামক তামসী তনু রহিয়াছেন। সিদ্ধগণ তাঁহাকে ''অনন্ত'' বলিয়া থাকেন। তিনি সহস্রশিরঃ এবং মস্তকে চিহ্ন তাঁহার ভূষণ স্বরূপ। তিনি জগতের হিতের নিমিত্ত সহস্র ফণা দ্বারা দশদিক আলোকিত করিয়া অসুরদিগের বলহানি করিতেছেন। তাঁহার এক হস্তে লাঙ্গল এবং অপর হস্তে মুষল। লক্ষ্মী ও বারুণী দেবী মূর্তিমতী হইয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করেন। কল্পান্তে তাঁহার বদন হইতে 'সঙ্কর্ষণ' নামক রুদ্র নিষ্ক্রান্ত হইয়া ত্রিজগৎ নাশ করেন। এই 'শেষ' বা অনন্তের ক্রোড়েই ভগবান শ্রীহরি অনন্ত শয্যায় শায়িত থাকেন। — ''শান্তাকারং ভুজগশয়নং পদ্মনাভং সুরেশং।''

সগুণ ব্রহ্ম সনাতন শ্রীকৃষ্ণ অনাদি আত্মা, প্রকৃতির অতীত নির্গুণ পুরুষ প্রভু; ভগবান পৃথক পৃথক তেজঃসম্পন্ন স্বয়ংজ্যোতি ও নিরন্তর রমমাণ। ইনি তেজস্বী সংহারকারকগণেরও সংহারক ঈশ্বর। মায়া ও মহত্তত্ত্বাদির প্রভাব তাহাতে নাই, গুণের আর কথা কি? মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার কখনও ইহাতে প্রবেশ করিতে পারে না। ইনি স্বেচ্ছায় নিজ তেজে ব্রহ্মকে সাকার করিয়া রচনা করেন। ইঁহা হইতে প্রথমে অতিশ্বেত দেহ দীর্ঘকায় 'শেষ' সমুৎপন্ন হন, তাঁহারই ক্রোড়ে মহালোক গোলোক অবস্থিত। গোলোকে শ্রীরাধা ও সখাগণসহ শ্রীকৃষ্ণ যথায় বিরাজ করেন, তাহার উত্তর দিকে হরিচন্দন বনে মণিমণ্ডপ শোভিত স্বর্ণপীঠোপরি সোনার সিংহাসনে রেবতীসহ সঙ্কর্ষণ হলায়ুধ বলরাম বা বলদেব বিরাজ করেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রিয়। তাঁহার গাত্রবর্ণ বিশুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায়, নয়নযুগল রক্তিম পদ্মপলাশবৎ এবং তাঁহার পরিধানে নীলাম্বর। তিনি দিব্যভূষণাদি ধারণ করিয়া আছেন। সঙ্কর্ষণ শ্রীকৃষ্ণের এক প্রধান সহচর। ত্রেতায় শ্রীশ্রীরামলীলায় রামানুজ লক্ষ্মণ এবং দ্বাপরে শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলায় শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ বলরাম ছিলেন অনন্তরূপী সঙ্কর্ষণদেবের অবতার।

ভারতের দক্ষিণে পূর্বসমুদ্রতীরবর্তী শ্রীপেরেম্বুদুর বা শ্রীমহাপ্রভূতপুরী নামক এক গ্রাম আছে। বহুকাল পূর্ব হইতেই এই স্থানে বহু দ্রাবিড় ব্রাহ্মণজাতির নিবাসস্থল ছিল। অদ্যাবধি দ্রাবিড় ব্রাহ্মণগণ বেদবিদ্যাকুশল, সদাচার সম্পন্ন ও নিষ্ঠাবান বলিয়া সর্বত্র সম্মানিত। আসুরি কেশবাচার্য্য দীক্ষিত্ এই দ্রাবিড় গ্রামের একজন নিবাসী ছিলেন। ইনি অতিশয় যজ্ঞনিষ্ঠ ছিলেন বলিয়া পণ্ডিতগণ ইহাকে ''সর্বক্রতু'' উপাধিদানে ভূষিত করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে ইনি শ্রীরঙ্গমের 'বিশিষ্টাদ্বৈত' মতের প্রতিষ্ঠাতা সিদ্ধাচার্য্য

যামুনাচার্য্যের নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। শ্রীশৈলপূর্ণ নামে যামুনাচার্য্যের আরেকজন প্রধান এবং প্রিয় শিষ্য ছিল। কেশবাচার্য্য শ্রীশৈলপূর্ণের ভগ্নী কান্তিমতীদেবীকে বিবাহ করেন।

বিবাহের পর বহুদিন অতিবাহিত হইলেও যখন কেশবের কোনও সন্তানাদি হইল না তখন অবশেষে কেশব ভাবিলেন যে যজ্ঞ দ্বারা শ্রীভগবানকে তুষ্ট করিতে পারিলে নিশ্চয়ই পুত্রমুখ দেখিতে পাইবেন। এই সময় একদা তিনি চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষ্যে স্বস্ত্রীক কৈরবিণী সাগর সঙ্গমে স্নানার্থ আগমন করেন। তথায় নিকটেই ছিল প্রসিদ্ধ পার্থসারথির মন্দির। তিনি স্নানান্তে শ্রীমূর্তির দর্শনার্থ আসিলেন। ভগবদ্ দর্শনের পর তাহার মনে হইল — এইখানেই ভগবৎসমীপে পুত্রার্থ এক যজ্ঞানুষ্ঠান করা যাউক। মনসংকল্প কার্য্যে পরিণত হইল। তিনি পার্থসারথির সম্মুখে মন্দির সংলগ্ন সরোবর তীরে পুত্র কামনায় এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেন। ঐদিন রাত্রে কেশব স্বপ্ন দেখিলেন — ভগবান পার্থসারথি তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, ''হে সর্বক্রতো! আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। জগতে ধর্মসংস্থাপনার্থ আমার অবতার গ্রহণ আবশ্যক হইয়াছে। সুতরাং আমাকেই তুমি পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইবে।'' স্বপ্ন দর্শনে কেশব অতীব প্রীত হইলেন এবং মনে মনে দৃঢ় নিশ্চয় করিলেন যে এইবার শ্রীভগবানের কৃপায় নিশ্চয়ই পুত্রলাভ হইবে। যথাসময়ে পত্নী কান্তিমতীর গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইল।

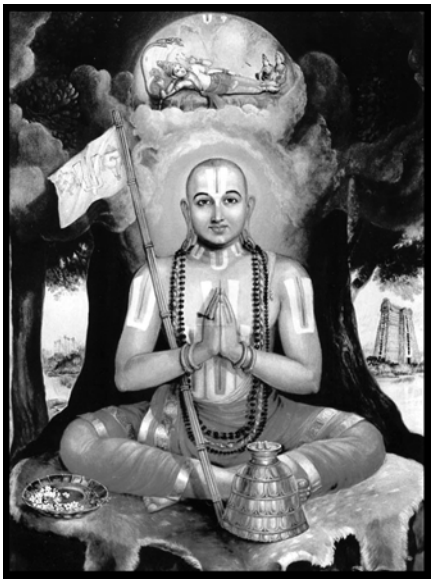

শ্রীরামানুজাচার্য্য

অনন্তর ৯৪১ শকাব্দ সৌর বৈশাখের শুক্লপক্ষীয় পঞ্চমী তিথিতে শুভক্ষণে কান্তিমতী এক পুত্ররত্ন প্রসব করিলেন। ইনিই সেই পরম ভাগবত ভগবান অনন্তদেবের অবতার শ্রীরামানুজাচার্য্য। শ্রীরামানুজাচার্য্যের সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে নাম ছিল 'লক্ষ্মণ'। অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করিলে উপনয়ন সংস্কারের পরে তাঁহার পিতৃদেব স্বয়ং পুত্রের শিক্ষাভার গ্রহণ করিলেন। বালক লক্ষ্মণের বুদ্ধি অসাধারণ তীক্ষ্ণ ছিল। বিদ্যাভ্যাসে তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা পরিলক্ষিত হইত। ইহাভিন্ন ধর্মানুষ্ঠানে এবং ধার্মিক সহবাসেও তাঁহার অধিক অনুরাগ প্রকাশ পাইত।

এই সময় কাঞ্চীনগরের সন্নিকটে পুণামেলি গ্রামে ''কাঞ্চীপূর্ণ'' নামে শূদ্রকুলজাত এক পরম ভাগবত বাস করিতেন। ইঁহার ভক্তি ও নিষ্ঠা সর্বজন বিদিত ছিল। অনেকে ভাবিত যে বিষ্ণুকাঞ্চীতে প্রতিষ্ঠিত ভগবান ''শ্রীবরদরাজ'' ইঁহার প্রত্যক্ষ হয়েন। অনেকে আবার তাঁহাকে শ্রীবরদরাজের নিকট স্ব-স্ব মনস্কামনার উত্তর প্রার্থনা করিবার জন্য অনুরোধ করিত। কাঞ্চীপূর্ণ প্রতিদিন ভগবৎ-পূজার্থ পুণামেলি হইতে কাঞ্চীপুরীতে গমন করিতেন। পুণামেলির পথ শ্রীপেরেম্বুদুর ভেদ করিয়া লক্ষ্মণের বাড়ীর সম্মুখ দিয়া চলিয়া গিয়াছে। অতএব প্রত্যহই কাঞ্চীপূর্ণকে লক্ষ্মণের গৃহের সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করিতে হইত।

একদিন সায়ংকালে লক্ষ্মণ বাড়ীর সামনে পথিমধ্যে বিচরণ করিতেছিলেন, এমন সময় কাঞ্চীপূর্ণকে পথিমধ্যে দেখিতে পাইলেন। কাঞ্চীপূর্ণের মুখ-জ্যোতি লক্ষ্মণের চিত্ত আকর্ষণ করিল। তিনি কাঞ্চীপূর্ণের দিকে মুগ্ধ নয়নে অপলক চাহিয়া রহিলেন। বালকের কোমল মুখকান্তি ও মহাপুরুষ-সঙ্কাশ লক্ষণাবলী দর্শন করিয়া কাঞ্চীপূর্ণও তাঁহার প্রতি পুনঃপুনঃ দেখিতে লাগিলেন এবং নিকটে আসিয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। লক্ষ্মণ আপন পরিচয় দিয়া কাঞ্চীপূর্ণকে ঐদিন তাঁহাদের গৃহে ভোজন করিতে অনুরোধ করিলে কাঞ্চীপূর্ণ তাহার আতিথ্য স্বীকার করিলেন। কাঞ্চীপূর্ণ লক্ষ্মণের গৃহে প্রবেশ করিলে লক্ষ্মণ তাঁহাকে বসিবার আসন প্রদান করিয়াই দ্রুতবেগে পিতার নিকট আসিলেন এবং বলিলেন — ''বাবা! আমি এই মহাপুরুষকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি। এঁনাকে আজ আমাদের গৃহে রাখিতে হইবে।'' কেশব কাঞ্চীপূর্ণকে চিনিতেন। তাই বলিলেন — ''বেশ করিয়াছ, উনি একজন পরম ভাগবত। তুমি খুব যত্ন করিয়া তাঁহার সেবা কর।'' এই কথা বলিয়া কেশব আসিয়া কাঞ্চীপূর্ণকে সাদরে সবিনয়ে অভ্যর্থনা করিলেন। তদনন্তর ভোজনকাল উপস্থিত হইলে লক্ষ্মণ কাঞ্চীপূর্ণকে সুচারুরূপে ভোজন করাইলেন এবং তারপর তাঁহার শয়নের ব্যবস্থা

করিয়া দিয়া তাঁহার পদসেবা করিতে উদ্যত হইলেন। কাঞ্চীপূর্ণ লক্ষ্মণের আচরণে অতীব চমৎকৃত হইলেন। তিনি ব্যগ্রভাবে লক্ষ্মণকে পদসেবা হইতে বিরত করিয়া বলিলেন —''বৎস! আমি নীচ শূদ্র আর তুমি সদ্‌ব্রাহ্মণ তনয় বৈষ্ণব। কোথায় আমি তোমার পদসেবা করিব না তুমিই আমার পদসেবা করিতে উদ্যত হইয়াছ। ছিঃ! এমন কার্য্য করিও না।'' ইহাতে লক্ষ্মণ একটু লজ্জিত হইয়া নিরস্ত হইলেন কিন্তু মনে মনে দুঃখিত হইয়া বলিলেন, ''কেন প্রভো! শুনিয়াছি শাস্ত্রে আছে, যিনি হরিভক্তি পরায়ণ, তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ; এই তো 'তিরুপান্নো আলোয়ার' চণ্ডাল হইয়াও ব্রাহ্মণের পূজনীয় হইয়াছিলেন। আপনি যখন হরিভক্তি পরায়ণ তখন আপনার পদসেবা করিতে দোষ কি?'' — লক্ষ্মণের কথা শুনিয়া কাঞ্চীপূর্ণ স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। ভাবিলেন, 'এ বালক কখনো সামান্য মানব হইতে পারেন না। ভবিষ্যতে ইনি নিশ্চয়ই ভবকর্ণধার হইবেন।' লক্ষ্মণ ও কাঞ্চীপূর্ণ একদিনের জন্য মিলিত হইলেন বটে, কিন্তু ইহার সংস্কার লক্ষ্মণের হৃদয়ে আজীবন বদ্ধমূল হইয়া রহিল। রামানুজের দাস্যভক্তি এবং বিশিষ্ট-অদ্বৈতমতের বীজ এই স্থানেই রোপিত হইয়া রহিল।

ইহার পর বহু ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া লক্ষ্মণের জীবনকাল অতিবাহিত হইয়া চলিতেছিল। ষোড়শবর্ষে লক্ষ্মণের বিবাহ ও পিতৃবিয়োগ, এই দুই ঘটনায় তাঁহার জীবনের গতিও পরিবর্তিত হইয়া চলিল। পিতৃবিয়োগের পর লক্ষ্মণ কাঞ্চীপুরের অদ্বৈত মতাবলম্বী শ্রীযাদব প্রকাশের নিকট বিদ্যাভ্যাস করিতে লাগিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই গুরুর সহিত বিদ্যার পাঠে তাঁহার মতভেদ হইতে লাগিল। বারম্বার মতভেদ হওয়ায় এবং শিষ্য গুরুর চেয়ে অধিক প্রতিভাশালী বুঝিতে পারিয়া শ্রীযাদব প্রকাশ তখন ছলে কৌশলে লক্ষ্মণের প্রাণনাশের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ভগবান যাঁহার সহায় হন তাঁহাকে মারে কে? ভগবৎকৃপায় লক্ষ্মণের প্রাণরক্ষা হইল। গভীর অরণ্য মধ্যে ব্যাধ ও ব্যাধপত্নীরূপে ভগবান ও ভগবতী তাঁহাকে লীলাচ্ছলে রক্ষা করিয়া দর্শন দান করিলেন। ইহাতে লক্ষ্মণের জীবনের গতি পরিবর্তন হইয়া গেল। তিনি পুনঃ আপন গৃহে মাতৃসমীপে প্রত্যাবর্তন করিলেন। মাতাকে সকল ঘটনাবৃত্তান্ত বলিলে পরে লক্ষ্মণ-জননী বরদরাজের পূজার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তিনি বুঝিলেন যে বরদরাজের কৃপাতেই যাদবের দুরভিসন্ধি হইতে তিনি তাঁহার প্রাণপ্রতিম পুত্রকে ফিরিয়া পাইয়াছেন। তাই লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া কান্তিমতী বরদরাজকে পূজা করিবার জন্য চলিলেন। সেখানে কাঞ্চীপূর্ণের সঙ্গে তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। সব শুনিয়া কাঞ্চীপূর্ণ লক্ষ্মণকে বলিলেন, ''বৎস! ভগবান বরদরাজ তোমার উপর অতীব প্রসন্ন, তাই তুমি এখন হইতে তাঁহার সেবায় নিরত থাক এবং নিত্য সেই অরণ্যের শালকূপের এক কলস জল আনিয়া তাঁহাকে স্নান করাইও; অচিরে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।'' ভক্তানুরাগী লক্ষ্মণ পরম ভাগবত কাঞ্চীপূর্ণের উপদেশ শিরোধার্য করিয়া নির্দেশমত বরদরাজের সেবা করিতে লাগিলেন। ইহার পর লক্ষ্মণ কাঞ্চীপূর্ণের সঙ্গে দিনে-দিনে ভক্তি-মাধুর্য্য অনুভব করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে তিনি এতই মুগ্ধ হইলেন যে কাঞ্চীপূর্ণের নিকট দীক্ষিত হইবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু কাঞ্চীপূর্ণ তাঁহাকে দীক্ষাদান করিলেন না। তথাপিও লক্ষ্মণ মনে মনে কাঞ্চীপূর্ণকেই গুরুপদে বরণ করিলেন। ফলে উভয়ের সখ্য আরও দৃঢ় হইল।

ক্রমে লক্ষ্মণের কথা সর্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িল। শ্রীরঙ্গমের প্রসিদ্ধ মহাত্মা বৃদ্ধ যামুনাচার্য্যও একদিন জনৈক বৈষ্ণবের মুখে তাঁহার বিষয়ে শ্রুত হইলেন। যামুনাচার্য্য ভাবিলেন, ''এতদিনে ভগবান আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছেন। যেরূপ শুনিতেছি তাহাতে মনে হইতেছে এই লক্ষ্মণই ভবিষ্যতে সমগ্র বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের গুরুর স্থান অধিকার করিতে পারিবেন।'' এই ভাবিয়া লক্ষ্মণকে দেখিবার মানসে যামুনাচার্য্য তখন শ্রীবরদরাজ-দর্শনে আসিলেন। সেখানে কাঞ্চীপূর্ণ যামুনাচার্য্যকে দূর হইতে লক্ষ্মণকে দেখাইয়া দিলেন। যামুনাচার্য্য তাঁহার সৌম্যমূর্তি দেখিয়া অতীব আকৃষ্ট হইলেন বটে কিন্তু লক্ষ্মণকে আহ্বান করিয়া তাহার সঙ্গে আলাপ করিলেন না। কি ভাবিয়া তিনি এইরূপ ইচ্ছা করিলেন না, ইহা স্থূল বুদ্ধি দ্বারা বিচার্য নহে। যামুনাচার্য্য লক্ষ্মণের সহিত বাক্যালাপ না করিলেও তিনি তাঁহাকে স্বমতে আনিবার জন্য নিত্য বরদরাজের নিকট আকুল হইয়া কৃপাভিক্ষা করিতে লাগিলেন। সম্ভবতঃ সেই হৃদয়-বিদারক ব্যাকুলতাপূর্ণ প্রার্থনার ফলেই লক্ষ্মণ ভবিষ্যতে জগদ্‌গুরু রামানুজাচার্য্য রূপে প্রকটিত হইয়াছিলেন। লক্ষ্মণের অবতার-ভাবের বিকাশের জন্য যামুনাচার্য্যের এইরূপ সাত্ত্বিক প্রার্থনা একটি প্রধান হেতু হইল।

পরবর্তীতে পূর্বগুরু যাদব প্রকাশের সহিত আরও নানান অপ্রিয় ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে মাতৃ-আদেশে লক্ষ্মণ কাঞ্চীপূর্ণকেই নিজ পথ প্রদর্শক নির্বাচন করিয়া লইলেন। লক্ষ্মণ পূর্বেই কাঞ্চীপূর্ণকে মনে মনে গুরুপদে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, কেবল মধ্যে যাদবপ্রকাশের পুনঃ সঙ্গপ্রভাবে

তাঁহার সে নিষ্ঠার কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম হইয়াছিল মাত্র।

এই ঘটনার কিছুদিন পরেই লক্ষ্মণের মাতৃবিয়োগ হইল। তিনি আপন প্রজ্ঞাবলে বহুকষ্টে শোক সংবরণ করিলেন। অন্যদিকে শ্রীরঙ্গমে যামুনাচার্য্যের শরীরও অসুস্থ হইয়া পড়িল। যামুনাচার্য্য কোনও লোক মারফৎ কাঞ্চীপূর্ণ ও লক্ষ্মণের সমাচার পাইলেন। যাদব প্রকাশের সহিত লক্ষ্মণের চির বিচ্ছেদের সমাচার শুনিয়া তিনি অবিলম্বে লক্ষ্মণকে আনিবার জন্যে মহাপূর্ণ নামে তাঁহার এক শিষ্যকে প্রেরণ করিলেন। মহাপূর্ণ কাঞ্চীপুরে উপস্থিত হইয়া কাঞ্চীপূর্ণের সহায়তায় লক্ষ্মণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মহাত্মা যামুনাচার্য্যের কথা বলিলেন। শুনিয়া লক্ষ্মণ বলিলেন— ''মহামুনি যামুনাচার্য্য? আহা, আমার ভাগ্যে কি সেই মহাপুরুষের দর্শনলাভ ঘটিবে?'' মহাপূর্ণ তাঁহাকে লইয়া যাইতে চাহিলে তিনি বরদরাজের স্নানসেবা করিয়া রওয়ানা হইলেন। কিন্তু ভগবানের লীলা বুঝা ভার। চারদিন অবিশ্রান্ত পথ চলিয়া যখন লক্ষ্মণ ও মহাপূর্ণ শ্রীরঙ্গমের পার্শ্বস্থ কাবেরী নদীতীরে উপস্থিত হইলেন তখন দেখিলেন যে পরপারে মহাজনতার ভিড়। অনুসন্ধানে তাঁহারা জ্ঞাত হইলেন যে, মহাত্মা যামুনাচার্য্য পরমপদ লাভ করিয়াছেন, নদীতীরে তাঁহারই অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে। এই কথা শোনা মাত্রই লক্ষ্মণ সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন এবং মহাপূর্ণ আসিয়া তাঁহাকে জলসিঞ্চনে চৈতন্য সম্পাদন করিয়া নানারূপে সান্ত্বনা দিলেন। কিয়ৎকাল পরে লক্ষ্মণের শোকাবেগ প্রশমিত হইলে তাঁহারা তখন নদী অতিক্রম করিয়া সমাধিস্থলে আসিয়া দেখেন যে তখনও যামুনাচার্য্যের সেই দিব্যমূর্তি বিরাজমান। লক্ষ্মণ সেই শ্রীবিগ্রহকে ভালভাবে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে মহামুনির দক্ষিণহস্তের তিনটি অঙ্গুলি মুষ্টিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। মৃত্যুকালে সকল অঙ্গই শিথিল ও বিস্তৃত হয়। কিন্তু যতক্ষণ শিথিল না হয় ততক্ষণ কখনও কখনও জীবনের লেশ রহিয়া যায়। তিনি শিষ্যবৃন্দকে মুনিবরের অঙ্গুলি স্বভাবতই মুষ্টিবদ্ধ থাকিত কিনা জিজ্ঞাসা করিলে দেহাবসানকালের ঘটনার বৃত্তান্ত অবগত হইলেন এবং তদনুযায়ী দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া সর্বসমক্ষে যামুনাচার্য্যের হৃদগত তিনটি অন্তিম বাসনার সত্যরূপায়ণ দান করিবেন এই প্রতিজ্ঞা করিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে লক্ষ্মণের মুখাশ্রিত বাক্য যেমনি একে একে উচ্চারিত হইতে লাগিল তেমনি সমাধিস্থ মহামুনি যামুনের অঙ্গুলি তিনটিও একে একে খুলিয়া গেল! সকলে এই ব্যাপার দেখিয়া চমকিত হইয়া গেলেন।

ইহার পর লক্ষ্মণ কাঞ্চীপুরীতে স্বগৃহে ফিরিয়া নিজ পত্নীকে দুই-একটি সান্ত্বনা বাক্য বলিয়াই কাঞ্চীপূর্ণের নিকট গমন করিলেন এবং যামুনাচার্য্যের কথায় সময় অতিবাহিত করিলেন। লক্ষ্মণ এখন হইতে অধিক সময় কাঞ্চীপূর্ণের নিকট থাকিতেন। এবার তিনি দৃঢ়ভাবে সংকল্প করিলেন, যেমন করিয়া হউক কাঞ্চীপূর্ণের নিকট হইতেই দীক্ষিত হইবেন। এই ভাবিয়া তিনি কাঞ্চীপূর্ণকে তাহার গৃহে ভোজন করিবার জন্যে নিমন্ত্রণ করিলেন। অন্তরে ইচ্ছা যে কাঞ্চীপূর্ণের উচ্ছিষ্টান্ন তিনি গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিকট দীক্ষা চাহিবেন। কিন্তু কাঞ্চীপূর্ণ লক্ষ্মণের উদ্দেশ্য বুঝিয়া ফেলিয়া ঘটনার প্রবাহ-কৌশলে অন্যভাবে এ বিষয়টিকে পরিচালনা করিলেন বলিয়া লক্ষ্মণের ভাগ্যে প্রসাদ ভক্ষণ হইল না বটে কিন্তু তখন হইতে কাঞ্চীপূর্ণের প্রতি তাঁহার অত্যধিক শ্রদ্ধা জন্মিল। তিনি বুঝিলেন যে কাঞ্চীপূর্ণ তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়াই কৌশল করিয়া তাঁহাকে প্রসাদ হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। যাই হোক, যেমন করিয়াই হউক তাঁহার নিকট মন্ত্রলাভ করিতে হইবে।

এদিকে কাঞ্চীপূর্ণ লক্ষ্মণের আচরণ দেখিয়া ভাবিলেন, 'ইহা প্রভুরই লীলা। হায়, কোথায় আমি ভক্তের দাসত্ব করিয়া জীবনযাপন করিব, না লক্ষ্মণের মতো ভক্ত আমার প্রসাদ খাইতে চাহে, শিষ্য হইয়া পদসেবা করিতে চাহে'। তিনি ব্যথিত চিত্তে বরদরাজকে বলিলেন — ''প্রভু! আমায় তিরুপতি যাইতে অনুমতি দিন; আমি তথায় যাইয়া আপনার বালাজী মূর্তির সেবা করিব। এখানে আর নয়। কি জানি, কোন দিন হয়ত কি বৈষ্ণবাপরাধ ঘটিবে?'' কাঞ্চীপূর্ণ বরদরাজ সিদ্ধ ছিলেন। বরদরাজ তাহার সহিত মানুষের মতো বাক্যালাপ করিতেন। সুতরাং তিনি কাঞ্চীপূর্ণকে তিরুপতি যাইতে অনুমতি দিলেন। এইরূপে প্রায় ছয়মাস অতীত হইলে বালাজী একদিন কাঞ্চীপূর্ণকে কাঞ্চীপুরীতে ফিরিয়া গিয়া বরদরাজের পুনঃ সেবা করিতে বলিলেন। বহুদিন পর কাঞ্চীপূর্ণ বরদরাজের মন্দিরাভিমুখে গমন করিতেছেন দেখিতে পাইয়া লক্ষ্মণ আনন্দে বিহ্বল হইয়া তাহার নিকট আসিয়া কোন কথা না বলিয়া একেবারে তাহার চরণে পতিত হইয়া বলিলেন— ''ভগবান! আপনাকে আমায় উদ্ধার করিতেই হইবে। আপনি ভিন্ন আমার আর গতি নাই। আপনি দয়া না করিলে কে আমায় ভক্তির পথ দেখাইবে? এত শাস্ত্রচর্চা করিয়াও আমার সন্দেহ কিছুতেই

যাইল না; সুতরাং আপনি আমায় উদ্ধার না করিলে আমার আর উপায় নাই।''

প্রকৃত ভক্ত কখনো অন্য ভক্তের দুঃখ দেখিতে পারেন না। কাঞ্চীপূর্ণ লক্ষ্মণের জন্য খুবই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। তিনি লক্ষ্মণকে বলিলেন, ''বৎস! তুমি ভাবিও না। অদ্য আমি বরদরাজকে তোমার কথা জিজ্ঞাসা করিব। তিনিই তোমায় গুরু মিলাইয়া দিবেন। তিনিই তোমার মনের সকল সংশয় দূর করিবেন। দেখ, আমি শূদ্র, আমি তোমায় দীক্ষা দিলে আচার বিরুদ্ধ কর্ম করা হইবে। আচার বিরুদ্ধ কর্ম করিলে লোক সমাজে নিন্দিত হইতে হয়। তুমি চিন্তা করিও না, ভগবান বরদরাজ তোমার ব্যবস্থা করিবেন।'' ঐ দিন লক্ষ্মণ তৎক্ষণাৎ কথঞ্চিৎ আস্বস্ত হইলেন এবং পরদিবস প্রাতে কাঞ্চীপূর্ণের মুখে বরদরাজের অভয়বাণী শুনিবেন বলিয়া খুবই উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিলেন।

ক্রমে নিশীথকাল সমাগত হইল। কাঞ্চীপূর্ণ সেই নির্জন মন্দির-গৃহে সুবৃহৎ তালবৃন্ত লইয়া ভগবানের সেবায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। কিছুক্ষণ পরে ভক্তবৎসল ভগবান বরদরাজ কাঞ্চীপূর্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন— ''বৎস! তুমি যেন আমায় কিছু বলিবার জন্য উৎসুক হইয়াছ দেখিতেছি। বল, তোমার কি জিজ্ঞাস্য?'' কাঞ্চীপূর্ণ ভক্তিগদগদচিত্তে প্রণতিপূর্বক বলিলেন—''প্রভু! আপনি সর্বান্তর্যামী, আপনি তো সকলই অবগত আছেন। আমি আজ লক্ষ্মণের কতিপয় মানসিক প্রশ্নের উত্তরের জন্য আপনার কৃপাভিক্ষা করিতেছি।'' বরদরাজ বলিলেন— ''হাঁ, বৎস! আমি সবই অবগত আছি। আর্য্য 'রামানুজ লক্ষ্মণ' আমার পরমভক্ত; তাহাকে সত্বর তুমি এই কথাগুলি বলিও। —

(১) ''অহমেব পরংব্রহ্ম জগৎ-কারণ-কারণম্। — (আমিই জগতের কারণের কারণ পরমব্রহ্ম।)

(২) ক্ষেত্রজ্ঞেশ্বরয়োর্ভেদঃ সিদ্ধ এব মহামতে। — (জীব ও ঈশ্বরের ভেদ সত্য)

(৩) মোক্ষোপায়ো ন্যাস এব জনানাং মুক্তিমিচ্ছতাম্ — (মুমুক্ষুজনের মোক্ষোপায় সর্বসন্ন্যাস অর্থাৎ প্রপত্তি।)

(৪) মদ্ভক্তানাং জনানাঞ্চ নাস্তিম্-স্মৃতিরিষ্যতে। (আমার ভক্তের অন্তিম স্মৃতি নিষ্প্রয়োজন।)

(৫) দেহাবসানে ভক্তানাং দদামি পরমং পদম্। (আমার ভক্তের দেহাবসানে আমি তাহাকে পরম পদ দিয়া থাকি)

(৬) পূর্ণাচার্য্যং মহাত্মানং সমাশ্রয় গুণাশ্রয়ম্।'' (মহাত্মা মহাপূর্ণকে গুরুপদে বরণ কর।)

প্রভাত হইতে না হইতেই লক্ষ্মণ কাঞ্চীপূর্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন। কাঞ্চীপূর্ণ তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন— ''বৎস 'রামানুজ'! তুমি ধন্য। ভগবান তোমার প্রশ্নের এই প্রকার উত্তর দিয়াছেন।'' এই বলিয়া তিনি লক্ষ্মণকে বরদরাজের সমস্ত আদেশই একে একে বলিলেন। বরদরাজ লক্ষ্মণকে 'রামানুজ' নামে অভিহিত করায় কাঞ্চীপূর্ণও তখন তাঁহাকে লক্ষ্মণ না বলিয়া ''রামানুজ'' বলিয়াই সম্বোধন করিলেন। কাঞ্চীপূর্ণ ছিলেন ভগবানের নিত্যসিদ্ধ নিত্যভক্তের মধ্যে একজন। তিনি প্রথম হইতেই লক্ষ্মণের মধ্যে ভগবৎ-লক্ষ্মণাবলী ও গুণাবলী সকল লক্ষ্য করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে 'লক্ষ্মণ' হইলেন ঈশ্বরকোটির ভগবৎ-সত্তা। এই কারণে, তিনি ভক্ত হইয়া ভগবানকে কেমন করিয়া দীক্ষাদান করিতে পারিবেন। ভক্ত কখনোই ভগবৎ-সত্তাকে দীক্ষাদান করিতে পারে না যদি না তিনি সাক্ষাৎ ভগবানের নির্দেশ পান। তাই সামাজিক শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ প্রদর্শন করিয়া তিনি লক্ষ্মণকে দীক্ষাদান করেন নাই। এক্ষেত্রে এই প্রমাণ হয় যে কাঞ্চীপূর্ণ কতবড় একজন পরম ভাগবত ছিলেন; আর অন্যদিকে বরদরাজের নির্দেশ এই প্রমাণ করিল যে 'লক্ষ্মণ' হইলেন সাক্ষাৎ 'সঙ্কর্ষণ' রূপ শ্রীরামের অনুজ অনন্তদেবের অবতার। ক্রমে এই বৃত্তান্ত জনসমক্ষে প্রচার হইয়া পড়িলে তখন সকলেই লক্ষ্মণকে ''রামানুজ'' বলিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে আবার লক্ষ্মণ ''রামানুজ'' হইলেন।

রামানুজাচার্য্যের পরবর্তীকালে আমরা আরও দুইজন সঙ্কর্ষণাবতার দেখিতে পাই। তাঁহারা হইলেন শ্রীচৈতন্যদেবপার্ষদ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও বৈষ্ণব শিরোমণি শ্রী চরণদাস বাবাজী। ইঁহারা তাঁহাদের জীবন-লীলার মাধ্যমে প্রমাণ করিয়া দিয়াছিলেন যে তাঁহারা সাক্ষাৎ সঙ্কর্ষণদেব বলরামের অবতার ছিলেন।

আচার্য্যরূপে (গুরুরূপে) ভগবান নিজ গতি প্রকাশ করেন। সর্বান্তর্যামী ভগবান আচার্য্যের চিত্তে অবস্থান করে তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশ পূর্বক শিষ্যের মুক্তি বিধান করেন। **—বেদান্ত কথা**